بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৪ জুলাই, ২০২০ মোতাবেক ২৪ ওফা, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত সা'দ (রা.)-এর স্মৃতিচারণ হচ্ছিল। হযরত সা'দ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে বদর, উহুদ, পরিখা, হুদায়বিয়া, খায়বার এবং মক্কা বিজয়সহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর দক্ষ তিরন্দাজ সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। হযরত সা'দ (রা.) সম্পর্কে এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন সেগুলোর একটি যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে এক সময় হযরত তালহা (রা.) ও হযরত সা'দ (রা.) ছাড়া অন্য কেউ ছিলেন না। মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধাভিজানে বের হওয়ার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে হযরত সা'দ (রা.) বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এমন অবস্থায় বের হতাম যে, গাছের পাতা ছাড়া আমাদের কাছে খাবার মতো আর কিছুই ছিল না। সেই সময় আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, আমাদের প্রত্যেকেই উট বা ছাগলের নাদির ন্যায় গুটি গুটি মল ত্যাগ করতাম। অর্থাৎ তা পুরোপুরি শক্ত হতো আর একটুও নরম হতো না। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, সেই দিনগুলোতে কাঁটাযুক্ত এক ধরনের গাছ বাবলার ফল ছিল আমাদের খাবার।

হযরত সা'দ (রা.) হলেন সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় রক্ত ঝরিয়েছেন এবং তিনিই সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র পথে তির নিক্ষেপ করেছিলেন আর এটি ছিল হযরত উবায়দা বিন হারেস (রা.)-এর যুদ্ধাভিযানের ঘটনা। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, দ্বিতীয় হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে একটি অভিযান পরিচালনা করা হয় যা সারিয়া হযরত উবায়দা বিন হারেস নামে খ্যাত। এর উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, (ইতিপূর্বেও আমি এর কিয়দংশ বরং আমার ধারণা এর পুরোটাই বর্ণনা করেছি। তথাপি এখানেও আমি তার বরাতে পুনরায় বর্ণনা করছি।)

রবিউল আউয়াল মাসের শুরুতে তিনি (সা.) তাঁর এক নিকটাত্মীয় উবায়দা বিন হারেস মুত্তালেবী (রা.)-এর নেতৃত্বে ৬০জন উষ্ট্রারোহী মুহাজিরদের একটি দল প্রেরণ করেন। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল মক্কার কুরাইশদের আক্রমণের সংবাদ সংগ্রহ করা। উবায়দা বিন হারেস (রা.) এবং তার সঙ্গীরা যখন কিছুটা পথ অতিক্রম করে সানিয়াতুল মারআ নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন তারা অকস্মাৎ দেখতে পান, কুরাইশদের সশস্ত্র কিছু যুবক ইকরামা বিন আবু জাহলের নেতৃত্বে তাবু গেড়ে রেখেছে। [সানিয়াতুল মারআ মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। মদিনায় হিজরতের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) এ স্থান দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন।] যাহোক, এই উভয় দল পরস্পরের মুখোমুখি হয় আর তাদের মাঝে তির ছোড়াছুড়ির ঘটনাও ঘটে। কিন্তু মুসলমানদের পেছনে কোন সহায়ক বাহিনী লুকিয়ে আছে ভেবে মুশরিকরা মোকাবিলা করা থেকে পিছু হটে আর মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া করে নি। যাহোক, মুশরিক বাহিনীর দু'জন হযরত মিক্বদাদ বিন আমর (রা.) এবং হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.) ইকরামা বিন আবু জাহলের নেতৃত্বাধীন (বাহিনী) থেকে পালিয়ে এসে মুসলমানদের সাথে যোগ দেয়। লেখা আছে যে, সুযোগ পেলেই তারা মুসলমানদের সাথে যোগ দিবে– এই উদ্দেশ্যেই তারা কুরাইশদের সাথে বেরিয়েছিলেন। কেননা তারা আন্তরিকভাবে মুসলমান

ছিলেন, কিন্তু নিজেদের দুর্বলতার কারণে কুরাইশদের ভয়ে তাদের জন্য হিজরত করা সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয় হিজরী সনের জমাদিউল উলা মাসে মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে ৮জন মুহাজির সদস্য বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্রদলের আমীর নিযুক্ত করে কুরাইশদের খবরাখবর সংগ্রহের জন্য খার্‌রারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। খার্‌রার হিজাযে জুহফার নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম। যাহোক তারা সেখানে যান কিন্তু শত্রুর সাথে তাদের কোন মোকাবিলা হয় নি।

পরবর্তী অভিযানের নাম হলো সরিয়া আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.)। এটি দ্বিতীয় হিজরী সনের জামাদিউল আখের মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এই অভিযানে হযরত সা'দ (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ ঘটনার উল্লেখও আমি ইতিপূর্বে একবার করেছিলাম কিন্তু সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকের বরাতে এখানেও সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করছি।

মহানবী (সা.) খুব কাছ থেকে কুরাইশদের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন যেন তাদের বিষয়ে সব ধরনের প্রয়োজনীয় খবরাখবর যথাসময়ে পাওয়া যায় এবং মদিনা সব ধরনের অতর্কিত আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে। অতএব এ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) আটজন মুহাজিরের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল গঠন করেন আর কৌশলগত কারণে এই দলে এমন সব সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করেন যারা কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন যেন কুরাইশদের গোপন দুরভিসন্ধির খবরাখবর সংগ্রহ করা সহজ হয়। মহানবী (সা.) এই দলের আমীর নিযুক্ত করেন তাঁর ফুপাতো ভাই হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.)-কে। তিনি (সা.) তাদেরকে অভিযানে প্রেরণের সময় উক্ত দলের দলপতিকেও একথা জানান নি যে, তাদেরকে কোথায় এবং কী উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে, বরং পথ চলতে চলতে তাদের হাতে একটি খামবন্ধ পত্র প্রদান করেন এবং বলেন, এই পত্রে তোমাদের জন্য দিক-নির্দেশনা রয়েছে। তোমরা যখন মদিনা থেকে দু'দিনের পথ অতিক্রম করবে তখন এই পত্র খুলবে এবং তাতে লিপিবদ্ধ নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করবে। যাহোক অবশেষে দু'দিনের পথ অতিক্রম করার পর তারা মহানবী (সা.)-এর নিদের্শনা অর্থাৎ এই পত্র খুলে দেখেন। সেই পত্রে লিখা ছিল, তোমরা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা উপত্যকায় যাবে এবং সেখানে গিয়ে কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করবে আর এরপর আমাদেরকে (পরিস্থিতি) সম্পর্কে অবগত করবে। পত্রের নিচে তিনি (সা.) এ পথনির্দেশও দেন যে, এই অভিযান সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তোমার কোন সাথি যদি এই দলে অন্তর্ভুক্ত থাকতে অনীহা প্রকাশ করে এবং ফিরে আসতে চায় তাহলে তাকে ফিরে আসার অনুমতি দিও। আব্দুল্লাহ্ তার সাথিদেরকে মহানবী (সা.)-এর উক্ত নির্দেশনা সম্পর্কে অবগত করেন, কিন্তু সবাই এক বাক্যে বলেন, আমরা সানন্দে এ কাজের জন্য প্রস্তুত আছি, আমাদের কেউ ফিরে যাবে না। এরপর সেই দল নাখলা উপত্যকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথিমধ্যে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)-এর উট কোথাও হারিয়ে যায় আর তারা তা খুঁজতে খুঁজতে নিজ সাথিদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অনেক খুঁজাখুঁজির পরও তাদের পাওয়া যায় নি, ফলে ৮ সদস্যের দলে মাত্র ৬জন অবশিষ্ট থাকে আর তারা সফর অব্যাহত রাখেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মীর্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) এক প্রাচ্যবিদ মিষ্টার মার্গোলিসের উল্লেখপূর্বক লিখেন, সে তার রীতি অনুসারে সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে লিখে,

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং উতবা (রা.) ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের উট ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং এই অযুহাত দেখিয়ে পশ্চাতে রয়ে যান। (অথচ) ইসলামের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত এসব সাহাবীদের জীবনের প্রতিটি ঘটনা তাদের বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের সাক্ষ্য

প্রদান করে। তাদের একজন বে'রে মঊনার যুদ্ধে কাফেরদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন এবং অপরজন কয়েকটি ভয়াবহ যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে অবশেষে ইরাক-বিজয়ী (সেনা নায়ক) হন; তাদের সম্পর্কে এ ধরনের সন্দেহ পোষণ করা আর তা-ও আবার নিছক নিজের কাল্পনিক ধারণার বশবর্তী হয়ে তা করা– এটি মিষ্টার মার্গোলিসেরই সাজে। মজার বিষয় হলো, মার্গোলিস সাহেব তার পুস্তকে এ দাবি করেছেন যে, এ পুস্তক আমি সব ধরনের বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে গিয়ে রচনা করেছি। যাহোক, মুসলমনাদের ক্ষুদ্র এ দলটি নাখলায় পৌঁছে নিজেদের কাজে অর্থাৎ খবরাখবর সংগ্রহের কাজে মনোযোগ নিবদ্ধ করে। তাদের কয়েকজন তো গোপনীয়তা রক্ষার্থে নিজেদের মাথা ন্যাড়া করে নেন যাতে পথিকরা তাদেরকে উমরার উদ্দেশ্যে আগত লোক মনে করে আর কোন ধরনের সন্দেহ না করে। কিন্তু সেখানে পৌঁছার পর তখনও তাদের বেশি সময় অতিবাহিত হয় নি, এমন সময় আকস্মিকভাবে কুরাইশদের ছোট একটি দল সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তারা তায়েফ থেকে মক্কায় যাচ্ছিল। উভয় দলই পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে যায় এবং এমন পরিস্থিতির অবতারণা হয় যে, মহানবী (সা.)-এর আদেশ ভিন্ন হওয়ার কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুসলমানরা অবশেষে উক্ত কাফেলার ওপর আক্রমণ করে কাফেলার সদস্যদের বন্দি বা হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাই তারা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আক্রমণ করেন যার ফলে কাফেরদের এক ব্যক্তি নিহত হয় এবং দুজন বন্দি হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চতুর্থ ব্যক্তি পালিয়ে যায় আর মুসলমানরা তাকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়। এভাবে তাদের পরিকল্পনা পুরোপুরি সফল হয় নি। যাহোক, এরপর মুসলমানরা কাফেলার ধনসম্পদ জব্দ করে নেয় আর বন্দি ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে তারা দ্রুত গতিতে মদিনায় ফিরে আসে। কিন্তু সাহাবীগণ (রা.) কাফেলার ওপর আক্রমণ করেছিলেন– একথা জানার পর মহানবী (সা.) খুবই মনঃক্ষুণ্ন হয়ে বলেন, **'মা আমারতুকুম বেকিতালিন ফি শাহ্‌রিল হারাম'** অর্থাৎ আমি তো তোমাদেরকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার অনুমতি দেই নি। তিনি (সা.) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিতে অস্বীকৃতি জানান। অপরদিকে কুরাইশরাও শোরগোল শুরু করে দিয়ে বলতে থাকে যে, মুসলমানরা পবিত্র মাসের পবিত্রতা পদদলিত করেছে। এছাড়া শোরগোলের অন্য কারণ হলো, যে ব্যক্তি মারা গিয়েছিল সে একজন নেতার পুত্র ছিল, নেতার পুত্র নয় বরং সে নিজেই একজন অনেক বড় নেতা ছিল (আর তার নাম ছিল) উমর বিন হাযরামি। যাহোক, ইত্যবসরে কাফিরদের লোকজন তাদের দুই বন্দিকে মুক্ত করার জন্য মদিনায় আসে, কিন্তু হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং উতবা বিন গাযওয়ান (রা.) তখনও ফিরে আসেন নি। তাই মহানবী (সা.) তাদের ব্যাপারে ভীষণভাবে শঙ্কিত ছিলেন, কেননা তারা যদি কুরাইশদের হাতে ধরা পড়েন তাহলে তারা তাদেরকে জীবিত ছাড়বে না। এজন্য মহানবী (সা.) তাদের ফিরে আসার পূর্বে বন্দিদের মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, আমার লোকেরা সুস্থ-সবলভাবে মদিনায় ফিরে এলে তখন আমি তোমাদের লোকদের মুক্ত করে দিব। তারা দুজন ফিরে এলে মহানবী (সা.) উভয় বন্দিকেই মুক্ত করে দেন। এই দুই বন্দির একজনের ওপর মদিনায় অবস্থানের এমন গভীর প্রভাব পড়ে যে, তিনি মুসলমান হয়ে যান এবং বে'রে মঊনার ঘটনায় শাহাদত বরণ করেন।

বদরের যুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়েও হযতর মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লিখেন, মহানবী (সা.) দ্রুতগতিতে বদর অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন আর বদরের কাছাকাছি পৌঁছে তিনি (সা.) কোন চিন্তার অধীনে, যার কথা রেওয়ায়েতে উল্লেখ নেই, হযরত আবু বকর (রা.)-কে নিজের বাহনে বসিয়ে ইসলামী সেনাদলকে পিছনে রেখে কিছুটা সামনে এগিয়ে যান। তখন পথে তাঁর সাথে এক বৃদ্ধ বেদুইনের সাক্ষাৎ হয়, যার সাথে কথায় কথায় তিনি (সা.) জানতে পারেন যে, কুরাইশদের সেনাদল বদর প্রান্তরের খুব কাছে অবস্থান করছে। মহানবী (সা.) এ সংবাদ শুনে ফিরে

আসেন। এরপর হযরত আলী (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আল-আওয়াম (রা.) এবং সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য অগ্রে প্রেরণ করেন। তারা বদর প্রান্তরে পৌঁছার পর হঠাৎ দেখতে পান মক্কার কয়েকজন লোক একটি জলাধার থেকে পানি নিচ্ছে। সেই সাহাবীরা (রা.) এই দলের ওপর আক্রমণ করে এক হাবসী দাসকে গ্রেফতার করে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) তাকে অত্যন্ত কোমল সুরে জিজ্ঞেস করেন, সেনাবাহিনী এখন কোথায় অবস্থান করছে? উত্তরে সে বলে, সামনের টিলার পিছনে। তিনি (সা.) আবার জিজ্ঞেস করেন, বাহিনীতে লোক সংখ্যা কত? সে উত্তর দেয়, অনেক, কিন্তু সঠিক সংখ্যা আমার জানা নেই। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, এটা বল যে, তাদের জন্য প্রতিদিন কয়টি উট জবাই করা হয়? সে বলে, দশটি। তিনি (সা.) সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, মনে হচ্ছে এই সৈন্যদলে এক হাজার লোক রয়েছে। বাস্তবে তারা এত সংখ্যকই ছিল। সম্ভবত এ ঘটনাটিও আমি পূর্বেও বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

বদরের যুদ্ধের সময় হযরত সা'দের বীরত্বের বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের সময় হযরত সা'দ পদাতিক হওয়া সত্ত্বেও অশ্বারোহীর মতো বীর-বিক্রমে লড়াই করছিলেন। এ কারণেই হযরত সা'দকে 'ফারিসুল ইসলাম' অর্থাৎ 'ইসলামের অশ্বারোহী' বলা হতো। উহুদের যুদ্ধের সময় হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অন্যতম ছিলেন যারা চরম অনিশ্চয়তার মাঝে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট দৃঢ়-অবিচল ছিলেন। উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের ভাই উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস, যে কিনা মুশরিকদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওপর আক্রমণও করেছিল; এ ঘটনাটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তার এক বক্তৃতায় এভাবে বর্ণনা করেন যে, উতবা সেই হতভাগা ব্যক্তি ছিল যে ভয়াবহ আক্রমণ করে হযরত আক্বদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর নিচের পাটির দু'টি পবিত্র দাঁত শহীদ করে এবং তাঁর (সা.) পবিত্র মুখমণ্ডল ভয়ংকরভাবে জখম বা ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। উতবার ভাই হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস মুসলমানদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি যখন উতবার দুর্ভাগা আচরণ সম্পর্কে জানতে পারেন তখন প্রতিশোধের নেশায় তার রক্ত টগবগ করতে থাকে। তিনি বলেন, আমি নিজ ভাইকে হত্যা করতে এত বেশি উদ্‌গ্রীব ছিলাম যে, সম্ভবত ইতিপূর্বে কখনোই আমি অন্য কোন জিনিসের জন্য এমন উদগ্রীব হই নি। সেই সীমালঙ্ঘনকারীর সন্ধানে আমি দুবার শত্রুব্যূহ ভেদ করে ঢুকে পড়ি যেন নিজের হাতে তাকে টুকরো টুকরো করে আমার মনটাকে শান্ত করতে পারি। কিন্তু আমাকে দেখে বারবার সে এমনভাবে কেটে পড়ে, যেভাবে শেয়াল লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়। অবশেষে আমি যখন তৃতীয়বার এভাবে (শত্রুদের মাঝে) ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছিলাম তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) স্নেহভরে আমাকে বলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তোমার কি জীবনটা খোয়ানোর ইচ্ছে হচ্ছে? তাই আমি হুযূর (সা.)-এর বাধার মুখে এ সংকল্প থেকে নিবৃত্ত হই।

উহুদের যুদ্ধের দিন যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে দৃঢ়-অবিচল সাহাবী মাত্র কয়েকজন বাকি ছিলেন, সেই সময় হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের অবস্থা সম্পর্কে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এভাবে লিখেছেন যে,

মহানবী (সা.) স্বয়ং হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের হাতে তির ধরিয়ে দেন আর সা'দ লাগাতার শত্রুকে লক্ষ্য করে তির ছুঁড়তে থাকেন। একবার মহানবী (সা.) তাকে বলেন, তোমার জন্য আমার পিতামাতা নিবেদিত, তুমি লাগাতার তির নিক্ষেপ করে যাও। সা'দ জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত এ শব্দগুলো অত্যন্ত গর্বের সাথে বর্ণনা করতেন।

এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) উহুদের যুদ্ধের দিন তূণ থেকে তির বের করে আমার সামনে রেখে দেন এবং বলেন

তির চালাও, তোমার জন্য আমার পিতামাতা নিবেদিত হোন। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি মহানবী (সা.)-কে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ছাড়া অন্য কারো জন্য তাঁর পিতামাতাকে উৎসর্গ করার দোয়া দিতে শুনিনি। তিনি হযরত সা'দকে উহুদের যুদ্ধের দিন বলেন তোমার জন্য আমার পিতামাতা নিবেদিত, তির চালাও হে শক্তিশালী যুবক! তির চালাও। এখানে এটিও উল্লেখযোগ্য যে, হযরত সা'দ ছাড়া হযরত যুবায়ের বিন আওয়ামের কথাও উল্লেখ হয়েছে যাকে মহানবী (সা.) বলেছিলেন, فِدَاکَ اَبِی وَ اُمِّی অর্থাৎ, তোমার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গিত। এটি বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত।

উহুদের যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সা'দ বলেন, উহুদের দিন মহানবী (সা.) তার জন্য নিজের পিতামাতাকে একত্রিত করেন। তিনি (রা.) বলেন, মুশরিকদের মাঝে এক ব্যক্তি ছিল, যে মুসলমানদের হৃদয়ে আগুন লাগিয়ে রেখেছিল। মহানবী (সা.) তাকে অর্থাৎ হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, তির নিক্ষেপ কর, তোমার জন্য আমার পিতামাতা নিবেদিত। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, (এ কথা শুনে) আমি ফলাবিহীন একটি তির তার পার্শ্ব বরাবর নিক্ষেপ করি যার ফলে সে নিহত হয় এবং তার লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে পড়ে। আর আমি দেখলাম, মহানবী (সা.) আনন্দে হেসে ফেলেন। আরেকটি রেওয়ায়েতে এ ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সেই মুশরিক, ইতিহাসের পুস্তকাবলীতে যার নাম হিব্বান বলা হয়েছে, একটি তির নিক্ষেপ করে যা হযরত উম্মে আয়মানের আঁচলে গিয়ে লাগে যখনকিনা তিনি আহতদের পানি পান করানোয় ব্যস্ত ছিলেন। এটি দেখে হিব্বান হাসতে থাকে। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে একটি তির দেন যা হিব্বানের কণ্ঠনালীতে গিয়ে লাগে এবং সে পিছনদিকে পড়ে যায়, যার ফলে তার নগ্নতা প্রকাশ পেয়ে যায়। এতে মহানবী (সা.) মুচকি হাসেন।

সহীহ্ মুসলিম শরীফের যে হাদীসটি এই মাত্র বর্ণনা করা হয়েছে, আমাদের জামা'তের নূর ফাউণ্ডেশন কর্তৃক অনুদিত এ হাদীসের অধীনে একটি নোট লেখা হয়েছে আর এটি খুব ভালো নোট। অর্থাৎ মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার এই অনুগ্রহের কারণে আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তিনি এমন একটি তিরের মাধ্যমে এক ভয়ঙ্কর শত্রুর জীবনাবসান ঘটিয়েছেন যার ফলাও ছিল না। অপর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত সা'দ (রা.) এক হাজার তির নিক্ষেপ করেছিলেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে সাক্ষী হিসেবে যেসব সাহাবী সন্ধিপত্রে সাক্ষর করেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন মুহাজিরদের তিনটি পতাকার মধ্যে একটি পতাকা ছিল হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর হাতে। বিদায় হজ্জের সময় হযরত সা'দ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত সা'দ বর্ণনা করেন, আমি মক্কায় অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাই। মহানবী (সা.) শুশ্রূষার জন্য আমার কাছে আসেন। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার অনেক ধনসম্পদ রয়েছে আর আমার উত্তরাধিকারী কেবল আমার একমাত্র কন্যা। তাই আমি কি আমার দুই-তৃতীয়াংশ ধনসম্পদ সদকা করে দিব? তিনি (সা.) বলেন, না। আমি নিবেদন করলাম, তাহলে কি অর্ধেক সম্পদ সদকা হিসেবে দিয়ে দিব? মহানবী (সা.) বলেন, না। আমি নিবেদন করলাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ সদকা করে দেই?

তখন মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে, কিন্তু এটিও অনেক বেশি। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, তুমি তোমার সন্তানদেরকে সম্পদশালী অবস্থায় রেখে যাওয়া তাদেরকে রিক্ত-হস্ত রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম, পাছে তারা মানুষের দ্বারে দ্বারে হাত পাততে থাকবে। আর তুমি যা-ই খরচ করবে তার বিনিময়ে প্রতিদান পাবে, এমনকি সেই লোকমার জন্যও যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি কি স্বীয় হিজরতের ক্ষেত্রে পিছনে থেকে যাব? তিনি (সা.) বলেন, তুমি যদি পিছনে থেকেও যাও তবুও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য তুমি যে আমল করবে তাতে তোমার সম্মান ও পদমর্যাদা উন্নীত হবে। আর আমি আশা রাখি যে, তুমি আমার পরেও জীবিত থাকবে (অর্থাৎ একইসাথে এই প্রত্যাশাও তিনি ব্যক্ত করেন), এমনকি জাতিসমূহ তোমার মাধ্যমে কল্যাণমণ্ডিত হবে এবং কিছু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর মহানবী (সা.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! আমার সাহাবীদের হিজরতকে তাদের জন্য পূর্ণতা দাও আর তুমি তাদেরকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিও না। আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ (রা.) বলেন, আমি অসুস্থ হলে মহানবী (সা.) আমার শুশ্রূষার জন্য আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি ওসীয়্যত করেছ? আমি নিবেদন করলাম, জ্বী হুযূর। মহানবী (সা.) বলেন, কতটা করেছ? আমি বললাম, আমি আমার সমস্ত ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করেছি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তাহলে তোমার সন্তানদের জন্য কী রেখেছ? আমি নিবেদন করলাম, তারা সম্পদশালী। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তাহলে এক দশমাংশ ওসিয়্যত কর। হযরত সা'দ বলেন, আমি এভাবেই বলতে থাকি আর তিনি (সা.) সেভাবেই বলতে থাকেন। অর্থাৎ হযরত সা'দ বেশি সম্পদ সদকা করতে চাচ্ছিলেন আর মহানবী (সা.) তাকে কম করতে বলছিলেন। অবশেষে মহানবী (সা.) বলেন, এক তৃতীয়াংশ সম্পদ ওসিয়্যত কর, আর এক তৃতীয়াংশও অনেক বেশি। যাহোক, জ্ঞানী ও ফিকাহবিদগণ এই রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে এ যুক্তি দেন যে, এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদের ওসিয়্যত হতে পারে না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, হাদীস সমূহও একথা সমর্থন করে যে, নিজের প্রয়োজনীয় খরচাদি রেখে বাকি সব সম্পদ বণ্টন করে দেয়া ইসলামী শিক্ষা নয়। যেমন মহানবী (সা.) বলেছেন,

ইয়াজিউ আহাদুকুম বেমালিহি কুল্লিহি ইয়াতাসাদ্দাকু বিহি ওয়া ইয়াজলিসু ইয়াতাকাফ্‌ফাফুন্নাসা, ইন্নামা সাদাকাতু আন যাহরিহি গিনান।

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কিছু লোক তাদের সমুদয় সম্পদ সদকার করার জন্য নিয়ে আসে, অতঃপর মানুষের কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাতে। সদকা কেবল অতিরিক্ত সম্পদ থেকে হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে তিনি আরো বলেন,

ইনতাযহার ওয়ারাসাতাকা আগনিয়াআ খায়রুম্ মিন আন তাযহারাহুম আলাতান ইয়াতাকাফ্‌ফাফূনান্ নাসা।

অর্থাৎ তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারীদের সম্পদশালী রেখে যাও তাহলে তা তাদেরকে নিঃস্ব বা দরিদ্র রেখে যাওয়ার চেয়ে অধিক উত্তম, পাছে তারা মানুষের দ্বারে দ্বারে হাত পাততে থাকবে। অনুরুপভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) মহানবী (সা.) এর কাছে দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ দান করার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি (সা.) তাকে নিষেধ করেন। এরপর তিনি অর্ধেক সম্পদ দান করতে চাইলে তিনি (স.) এটি করতেও নিষেধ করেন। এরপর তিনি এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দান করার অনুমতি প্রর্থনা করেন।

তিনি (সা.) এ পরিমাণ সম্পদ দান করার অনুমতি দেন, কিন্তু একই সাথে তিনি (সা.) এটিও বলেন যে, এক তৃতীয়াংশ ওসিয়্যত কর, যদিও তৃতীয়াংশও অনেক বেশি, **'আস্‌সুলুসু ওয়াস্‌ সুলুসু কাসির'**। মোটকথা এ ধারনা যে, ইসলামের আদেশ হলো, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব সম্পদ দান করে দেয়া উচিত– এটি সম্পূর্ণভাবে ইসলাম বিরোধী এবং সাহাবীদের রীতিপরিপন্থী, কেননা সাহাবীদের কতক এরূপ ছিলেন যাদের মধ্য থেকে কয়েকজনের মৃত্যুর পর লক্ষ লক্ষ টাকা তাদের উত্তরাধীকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন, আমি মক্কায় অসুস্থ হলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার শুশ্রূষার জন্য আসেন এবং তিনি (সা.) আমার বুকে হাত রাখেন। তখন আমি আমার হৃদয়ে তাঁর (সা.) হাতের শীতলতা অনুভব করলাম। তিনি (সা.) হাত রেখে আমাকে বলেন, তোমার তো হৃৎরোগ রয়েছে, তাই তুমি হারিস বিন কালাদা-র কাছে যাও, যে বনু সাকিফ গোত্রের ভাই। সে একজন চিকিৎসক। তাকে গিয়ে বল, সে যেন মদিনার সাতটি আজওয়া খেজুর আঁটিসহ চূর্ণ করে এবং তোমাকে ঔষধস্বরূপ পান করায়। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত সা'দের দেখাশুনা করার জন্য মক্কায় এক ব্যক্তিকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করেন এবং তিনি (সা.) তাকে বিশেষভাবে তাগিদ করেন যে, যদি হযরত সা'দ মক্কায় মৃত্যু বরণ করেন তবে তাকে যেন কিছুতেই মক্কায় দাফন করা না হয়, বরং মদিনায় নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে দাফন করা হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত সা'দ-এর শিকার সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মহানবী (সা.) যদিও নিজে শিকার করতেন না, কিন্তু বিভিন্ন হাদীস থেকে সাব্যস্ত হয় যে, তিনি শিকার করাতেন। যেমন এক যুদ্ধাভিযানে তিনি সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে ডাকেন এবং বলেন, ঐ যে দেখ! হরিণ যাচ্ছে, ওটাকে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ কর। তিনি যখন তির নিক্ষেপ করতে উদ্যত হন তখন তিনি (সা.) স্নেহের সাথে নিজের চিবুক তার (রা.) কাঁধে রাখেন এবং বলেন, হে খোদা! তার তির যেন লক্ষ্য ভেদে ব্যর্থ না হয়। হযরত সা'দকে আল্লাহ্ তা'লা এ সৌভাগ্যও দান করেছিলেন যে, ইরাক তাঁর (রা.) হাতে বিজিত হয়েছিল। পরিখার যুদ্ধের সময় একবার সাহাবীগণ মহানবী (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, পরিখায় একটি পাথর প্রতিবন্ধক হয়েছে, যা ভাঙা যাচ্ছে না। হুযূর (সা.) সেখানে উপস্থিত হন এবং কোদাল দ্বারা সেই পাথরে ওপর তিনটি আঘাত করেন। প্রত্যেকবার পাথর কিছুটা করে ভেঙে যায় আর মহানবী (সা.) উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলেন এবং তাঁর অনুসরণে সাহাবীরাও স্লোগান দেন। সেই সময় একবার কোদাল মেরে তিনি (সা.) বলেন, আমাকে মিদিয়ানের শুভ্র প্রাসাদগুলোর পতন দেখানো হয়েছে। তিনি (সা.) যা দেখেছিলেন তা হযরত সা'দের (রা.)-এর মাধ্যমে পূর্ণত পায়।

আরবের (বিভিন্ন অংশে) দুটি বড় বড় শক্তি ছিল; একটি কিসরা (পারস্য), অপরটি কায়সার (কন্সটান্টিনোপল)। ইরাকের বড় অংশ পারস্যের অধীনস্ত ছিল এবং মিদিয়ানে তাদের রাজপ্রাসাদ ছিল। মাদায়েন, কাদসিয়া, নাহাওয়ান্দ এবং জলুলার বিখ্যাত যুদ্ধ হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের (রা.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল।

মিদিয়ানের পরিচয় হলো- এটি ইরাকের বাগদাদ থেকে কিছুটা দূরে দক্ষিণ দিকে দাজলা নদীর তীরে অবস্থিত। যেহেতু এখানে একের পর এক বেশ কয়েকটি শহর গড়ে উঠেছিল এজন্য আরবরা এটিকে মাদায়েন অর্থাৎ কয়েকটি শহরের সমষ্টি বলা আরম্ভ করে। কাদসিয়া-ও ইরাকের একটি শহর ছিল যেখানে মুসলমান এবং পারস্যবাসীদের মাঝে বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যেটিকে কাদসিয়ার যুদ্ধ বলা হয়। বর্তমান কাদসিয়া শহরটি কুফা থেকে পনেরো মাইল দূরে অবস্থিত। নাহাওয়ান্দ বর্তমান ইরানে অবস্থিত একটি শহর যা ইরানের হামদান প্রদেশে অবস্থিত এর রাজধানী হামদান থেকে সত্তর কিলোমিটার দক্ষিণে

অবস্থিত। জলুলা বর্তমান ইরাকের একটি শহর যা দাজলাতুল আয়মান নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে মুসলমান এবং পারস্যবাসীদের মাঝে যুদ্ধ হয়েছিল। এর নাম জলুলা এজন্য রাখা হয়েছিল যে, এ শহরটি ইরানীদের লাশে ভরে গিয়েছিল। হযরত আবু বকরের যুগে ইরানীদের বার বার সীমান্তে গোলযোগ সৃষ্টি করার দরুণ হযরত মুসান্না বিন হারেসা ইরাকে অভিযান পরিচালনা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। হযরত আবু বকর তাকে অনুমতি প্রদান করেন আর হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদকে (রা.) একটি বড় সেনাবাহিনীসহ তার সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। সিরিয়া থেকে যখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) খিলাফতের দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদকে (রা.) তার সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) ইরাকে হযরত মুসান্নাকে (রা.) নিজের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন। কিন্তু হযরত খালেদের (রা.) ইরাক থেকে চলে যেতেই এই অভিযান নিস্তেজ হয়ে পড়ে। হযরত উমর (রা.) যখন খলীফা হন তখন তিনি নুতনভাবে ইরাকের অভিযানের দিকে মনোযোগ প্রদান করেন। হযরত মুসান্না (রা.) বুআয়েব এবং অন্যান্য যুদ্ধে শত্রুদেরকে বারংবার পরাজিত করে ইরাকের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে নেন। তখন ইরাক পারস্য সম্রাটের অধীনস্ত ছিল। ইরানীরা যখন মুসলমানদের রণদক্ষতা আঁচ করতে পারে পারে এবং তাদের ক্রমাগত বিজয় তাদের চোখ খুলে দেয়; তখন তারা বুরান দুখ্‌ত নামের একজন মহিলা, যে তাদের সম্রাজ্ঞী ছিল; তার পরিবর্তে কিসরার বংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ইয়াযদজার্‌দকে সিংহাসনে আরোহন করায়। সে সিংহাসনে আরোহন করেই ইরানী সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তিকে সুসংহত করে। পুরো দেশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা ও প্রতিশোধের আগুন প্রজ্বলিত করে। এমন পরিস্থিতিতে হযরত মুসান্নাকে (রা.) বাধ্য হয়ে আরবের সীমান্ত থেকে সরে যেতে হয়। হযরত উমর (রা.) যখন এসব ঘটনা জানতে পারেন তখন তিনি আরবের সর্বত্র দক্ষ বক্তাদের প্রেরণ করেন এবং কিসরার বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে রুখে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেন। ফলে আরবে এক উচ্ছ্বাস ও উদ্যম সৃষ্টি হয় এবং চতুর্দিক থেকে ইসলামের ভালোবাসায় নিবেদিত ব্যক্তিরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে রাজধানীর দিকে ছুটে আসে। হযরত উমর (রা.) এ অভিযানের নেতৃত্ব কার কাছে সোপর্দ করা যায়– সে বিষয়ে পরামর্শ করেন। সর্বসাধারণের পরামর্শক্রমে হযরত উমর (রা.) নিজেই এই অভিযানের নেতৃত্ব প্রদানের লক্ষ্যে প্রস্তুত হন, কিন্তু হযরত আলী (রা.) এবং জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মতামত তাতে প্রতিবন্ধক হয়, অর্থাৎ তারা এতে বাধা দেন। এর জন্য হযরত সাঈদ বিন যায়েদের নামও উপস্থাপন করা হয়। এরই মাঝে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ দণ্ডায়মান হন এবং নিবেদন করেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের জন্য আমি সঠিক ব্যক্তির সন্ধান পেয়েছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, তিনি কে? হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, তিনি হলেন হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)। অতঃপর সবাই হযরত সা'দ (রা.)-এর পক্ষে ঐক্যমত পোষণ করেন আর হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ (রা.) সম্পর্কে বলেন-

'ইন্নাহু রাজুলুন সুজাউন রাউন' অর্থাৎ তিনি একজন অত্যন্ত বীর, নির্ভীক এবং শক্তিশালী তিরন্দায ব্যক্তি। হযরত মুসান্না কুফা এবং ওয়াসেত এর মধ্যবর্তী যি-কার নামক স্থানে আট হাজার নিবেদিত প্রাণ সাহসী যোদ্ধার সাথে হযরত সা'দের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে ডাক আসলে তার মৃত্যু হয় আর তিনি তার ভাই হযরত মুআন্নাকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। হযরত মুআন্না দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী হযরত সা'দ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং হযরত মুসান্নার সংবাদ পৌঁছে দেন। হযরত সা'দ তার সৈন্যদের হিসাব নিয়ে দেখেন যে, এটি প্রায় ত্রিশ হাজার সৈনিকের বাহিনী। তিনি সৈন্যদলকে বিন্যস্ত করেন আর সৈন্যদের ডান ও বাম অংশে বন্টন করে তাদের জন্য পৃথক পৃথক নেতা নিযুক্ত করেন এবং সম্মুখ পানে অগ্রসর হয়ে কাদসিয়াকে ঘেরাও করেন। কাদসিয়ার অভিযান ১৬

হিজরী সনের শেষের দিকে হয়। এতে কাফেরদের সংখ্যা দুই লাখ আশি হাজারের কাছাকাছি ছিল আর এই সৈন্যদলের মাঝে ত্রিশটি হাতি ছিল। ইরানী বাহিনীর নেতৃত্ব রুস্তমের হাতে ছিল। হযরত সা'দ কাফেরদেরকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান আর এর জন্য তিনি হযরত মুগীরা বিন শু'বাকে প্রেরণ করেন। রুস্তম তাকে বলে যে, তোমরা হলে কপর্দকহীন আর এই দারিদ্রতা ঘোচানোর জন্য তোমরা এসব করছ। আমরা তোমাদের এত দিব যে, তোমাদের পেট ভরে যাবে। হযরত মুগীরা উত্তরে বলেন, আমরা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর ডাকে সাড়া দিয়েছি, আমরা তোমাদেরকে এক খোদা তা'লার প্রতি এবং তাঁর নবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নের দাওয়াত দিচ্ছি। যদি তোমরা এটি গ্রহণ কর তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম। তা না হলে যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে এবং তরবারি আমাদের ও তোমাদের মাঝে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। এই উত্তরে রুস্তম-এর চেহারা রক্তিম হয়ে যায়। সূচনা তাদের পক্ষ থেকে হয় এবং তারা যুদ্ধ করতে চাচ্ছিল। তিনি (রা.) বলেন, আমরা এখনও যুদ্ধ করতে চাই না, বরং আমরা তোমাদেরকে ইসলামের তবলীগ করছি, ইসলামের সংবাদ দিচ্ছি, কিন্তু তোমরা যদি যুদ্ধ কামনা কর তাহলে ঠিক আছে, তরবারি-ই এর সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। যাহোক তার চেহারা রক্তিম হয়ে যায় আর সে যেহেতু মুশরিক ছিল তাই সে অনুসারে বলে, চন্দ্র ও সূর্যের কসম, সকাল হওয়ার পূর্বেই আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করব এবং তোমাদের সবাইকে টুকরো টুকরো করে ফেলব। হযরত মুগীরা বলেন, **'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্'**। সকল শক্তির উৎস ও কেন্দ্রবিন্দু হলেন আল্লাহ্ তা'লা, আর একথা বলে তিনি নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করেন। হযরত সা'দ হযরত উমরের বার্তা লাভ করেন যে, প্রথমে তাদেরকে ইসলামের তবলীগ কর। অতএব হযরত সা'দ বিখ্যাত কবি এবং অশ্বারোহী হযরত উমর বিন মাদি কারিব এবং হযরত আশআস বিন কায়েস কিন্দিকে এই প্রতিনিধি দলের সাথে প্রেরণ করেন। রুস্তমের সাথে তাদের দেখা হলে সে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছ। তিনি উত্তর দেন, তোমাদের গভর্ণরের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি। তখন রুস্তম এবং তাঁর মাঝে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রতিনিধি দলের লোকেরা বলেন, আমাদের নবী (সা.) আমাদের সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, আমরা তোমাদের এলাকা জয় করব। একথা শুনে রুস্তম মাটির ঝুড়ি আনায় এবং বলে, নাও, এটি আমাদের ভূমি, এটিকে মাথায় উঠিয়ে নাও। হযরত উমর বিন মাদি কারিব দ্রুত উঠেন এবং মাটির ঝুড়ি নিজের ঝুলিতে রেখে রওয়ানা হয়ে যান আর বলেন, এটি একথার পূর্বলক্ষণ যে, আমরা বিজয়ী হব এবং তাদের ভূমি আমাদের করতলগত হবে। তারপর তিনি ইরানের বাদশাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হন এবং তাকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। এতে সে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয় এবং বলে, আমার দরবার থেকে বেরিয়ে যাও। তোমরা যদি দূত না হতে, তবে আমি তোমাদেরকে হত্যার আদেশ দিতাম। এরপর সে রুস্তমকে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দেয়ার নির্দেশ দেয়। বৃহস্পতিবার যোহরের নামাযের পর যুদ্ধের ঢাক বেজে উঠে। হযরত সা'দ তিনবার উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করেন আর চতুর্থবারে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। হযরত সা'দ অসুস্থ ছিলেন এবং রণক্ষেত্রের নিকটবর্তী উজাইব দুর্গের বালাখানায় বসে সৈন্যদলকে দিকনির্দেশনা প্রদান করছিলেন।

এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে খসরু পারভেযের পৌত্র ইয়াযদজার্দ এর সিংহাসনে আসীন হওয়ার পর ইরাকে বৃহৎ পরিসরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। তখন হযরত উমর তাদের মোকাবিলার জন্য হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। হযরত সা'দ যুদ্ধের জন্য কাদসিয়ার ময়দানকে বেছে নেন এবং হযরত উমরকে এই রণক্ষেত্রের একটি নকশা প্রেরণ করেন। হযরত উমর এই স্থানটিকে পছন্দ করেন, কিন্তু একইসাথে তিনি এটিও লিখেন যে, ইরানের বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করার পূর্বে

তোমার জন্য আবশ্যক হলো- ইরানের বাদশাহ্‌র নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা এবং তাকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো। অতএব এই আদেশ লাভ করে তিনি একটি প্রতিনিধি দলকে ইয়াযদজার্‌দ-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রেরণ করেন। যখন এই প্রতিনিধি দল ইরানের বাদশাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হয়, ইরানের বাদশাহ্‌ তার অনুবাদককে বলে, এদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, এরা এখানে কেন এসেছে। তার এই প্রশ্ন শুনে প্রতিনিধি দলের প্রধান হযরত নো'মান বিন মুকার্‌রিন উঠে দাঁড়ান এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের সংবাদ প্রদান করে বলেন, তিনি (সা.) আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ করি এবং পুরো বিশ্বকে সত্যধর্মে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য আহ্বান জানাই। এ আদেশ অনুযায়ী আমরা আপনার কাছে এসেছি এবং আপনাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। ইয়াযদজার্‌দ এই উত্তরে চরম ক্রুদ্ধ হয় এবং বলে, তোমরা এক জঙ্গলী এবং মৃত ভক্ষণকারী জাতি। তোমাদেরকে যদি ক্ষুধা এবং দারিদ্র এ আক্রমণের জন্য বাধ্য করে থাকে তাহলে আমি তোমাদের সবাইকে এত পরিমাণ পানাহার সামগ্রী দিতে প্রস্তুত আছি যে, তোমরা শান্তিতে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতে পারবে। অথচ সূচনা তাদের পক্ষ থেকেই হয়েছিল আর এরপর অপবাদও সে মুসলমানদেরকেই দিচ্ছিল। যাহোক, এরপর সে বলে, একইভাবে তোমাদেরকে পরিধানের জন্য পোশাকও দিব। তোমরা এগুলো নিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে যাও। অর্থাৎ এখানে সীমান্তসমূহে বসে থেকে নিজেদের সীমানা পাহারা দেয়া পরিত্যাগ কর আর আমি যেমনটি চাচ্ছি আমাকে এই এলাকা দখল করতে দাও। তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে কেন নিজেদের জীবননাশ করতে চাও? যখন সে তার কথা শেষ করল, তখন ইসলামি প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে হযরত মুগীরা বিন যুরারাহ দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, আপনি আমাদের সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করেছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক। আমরা প্রকৃতপক্ষেই এক জঙ্গলী এবং মৃত ভক্ষণকারী জাতি ছিলাম। সাপ, বিচ্ছু, পঙ্গপাল ও টিকটিকি পর্যন্ত খেয়ে ফেলতাম, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের প্রতি কৃপা করেছেন এবং তিনি তাঁর রসূল (সা.)-কে আমাদের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা তার কথার উপর আমল করেছি। যার ফলে এখন আমাদের মাঝে এক বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে আর আমাদের মাঝে সেসব মন্দ বিষয় বিদ্যমান নেই যেগুলোর উল্লেখ আপনি করেছেন। এখন আমরা কোনভাবে প্রলুব্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তুত নই। আপনার সাথে আমাদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। এখন সিদ্ধান্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রেই হবে। পার্থিব অর্থ-সম্পদের লালসা আমাদেরকে আমাদের সংকল্প থেকে বিরত রাখতে পারবে না। ইয়াযদজার্‌দ এ কথা শুনে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয় এবং এক ভৃত্যকে ডেকে বলে, যাও মাটির একটি বস্তা নিয়ে আস। মাটির বস্তা নিয়ে আসা হলে সে ইসলামী প্রতিনিধিদলের নেতাকে সামনে ডাকে এবং বলে, যেহেতু তোমরা আমার প্রস্তাবনা প্রত্যাখ্যান করেছ তাই এখন মাটির এ বস্তা ছাড়া তোমরা আর কিছু পাবে না। সেই সাহাবী অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে অগ্রসর হন এবং মাথা ঝুঁকিয়ে মাটির বস্তা পিঠে নিয়ে লাফ দিয়ে দ্রুত দরবার থেকে বেরিয়ে উচ্চস্বরে নিজের সঙ্গীদের বলেন, আজকে ইরানের বাদশা নিজ হাতে নিজের দেশের মাটি আমাদের হাতে সোপর্দ করেছে, একথা বলে ঘোড়ায় চড়ে তিনি দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করেন। বাদশাহ্‌ তার এই স্লোগান শুনে কেঁপে উঠে আর তার সভাসদদের দৌড়ে গিয়ে তার কাছ থেকে মাটির বস্তা ফিরিয়ে আনতে বলে, কেননা এটি খুবই অশুভ লক্ষণ যে, আমি নিজ হাতে আমার দেশের মাটি তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। কিন্তু ততক্ষণে তিনি ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূর চলে গিয়েছিলেন। অবশেষে তা-ই হয় যা তিনি বলেছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই পুরো ইরান মুসলমানদের করায়ত্বে চলে আসে। মুসলমানদের মাঝে এই মহা বিপ্লব কীভাবে সৃষ্টি হলো? কুরআনী শিক্ষা তাদের চরিত্র ও অভ্যাসে এমন এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল যা তাদের হীন জীবনের ওপর এক মৃত্যু আনয়ন করেছিল আর তাদেরকে উন্নত

নৈতিক চরিত্রে উপনীত করেছিল। আর এর ফলে তারা জগতে প্রকৃত ইসলাম প্রচারের ভূমিকা পালন করেন আর ইসলামী শিক্ষার ওপর আমল করা-ই তাদেরকে প্রকৃত মুসলমান বানিয়েছে। কোন ভয়-ভীতি বা কোন প্রকার শক্তি তাদেরকে ভীত করতে পারে নি। যাহোক, তার স্মৃতিচারণের কিছু অংশ এখনও বাকি আছে তা পরবর্তীতে উপস্থাপন করব, ইনশাআল্লাহ্।

আজও আমি কয়েক ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব। তাদের মধ্য থেকে প্রথম জানাযাটি হলো, মোহতরমা বুশরা আক্রাম সাহেবার। তিনি পাকিস্তানের নাযের তালীমুল কুরআন ওয়াকফে আরযী মুহাম্মদ আক্রাম বাজওয়া সাহেবের স্ত্রী। তিনি গত ২৫শে মার্চ ৬৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কারণে তখন জানাযা পড়ানো হয় নি। তিনি আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ওসীয়্যত করেছিলেন। তার সন্তানাদির মাঝে রয়েছে দুই পুত্র ও এক কন্যা। বুশরা আক্রাম সাহেবা তার স্বামী জনাব আক্রাম বাজওয়া সাহেবের সাথে ১৫ বছর লাইবেরিয়াতে বসবাস করেন। তখন তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্ লাইবেরিয়ার সদর হিসেবে কাজ করার সুযোগ লাভ করেন। লাইবেরিয়াতে গৃহযুদ্ধের সময় তার স্বামী-সন্তানসহ পনের দিন পর্যন্ত তাকে সেনাব্যারাকে অবরুদ্ধ রাখা হয়। মুহাম্মদ আক্রাম বাজওয়া সাহেব লিখেন, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা, ধৈর্য এবং বিশ্বস্ততার সাথে দীর্ঘ ৩৭ বছর একজন ওয়াকফে জিন্দেগীর (অর্থাৎ তার) সঙ্গ দিয়েছেন। বিশেষ করে আমার যখন মুবাল্লেগ হিসেবে লাইবেরিয়াতে নিযুক্তি হয়, (সেখানে তিনি জামা'তের আমীরও ছিলেন) সেখানে দীর্ঘ ২৩ বছর অবস্থানকালে তবলীগি ও তরবিয়তি কার্যক্রমেও মরহুমা সহযোগিতা করেছেন। অতিথি আপ্যায়নসহ জামা'তের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সহযোগী ছিলেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রেসিডেন্ট হিসেবেও কাজ করার সুযোগ লাভ করেছেন। ১৫ বছর যাবৎ লাইবেরিয়াতে অবস্থানকালে তিনি বেশ কয়েকবার ম্যালেরিয়া ও টাইফয়েডে আক্রান্ত হন, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিতান্ত ধৈর্য সহকারে আমার সহকর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধের নিরিখে অতি উত্তমভাবে সন্তানদের তরবিয়ত করেছেন। তার দুই সন্তান মাশাআল্লাহ্ অত্যন্ত বিশ্বস্ততা সহকারে জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত আছেন। সেখানকার স্কুলের প্রিন্সিপাল ওয়াকফে জিন্দেগী মনসুর নাসের সাহেব লিখেন, লাইবেরিয়াতে আমি যখন একা ছিলাম তখন তিনি টানা তিন বছর আমাকে নিজের বাড়িতে রেখে আতিথেয়তা করেছেন এবং নিজ সন্তানের মতো বা ছোট ভাইয়ের মতো করে রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরও তার দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন এবং মরহুমার পুণ্যকর্ম সমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহসুলভ ব্যবহার করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো ইকবাল আহমদ নাসের পীরকোটি সাহেবের। তিনি ক্রুণ্ডি জেলার অন্তর্গত ক্ষেরপুর নিবাসী ছিলেন। তিনি গত ১৪ জুলাই ২০২০ তারিখে ৮২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পুত্র আকবর আহমদ তাহের সাহেব বুর্কিনা ফাসোতে মুরব্বী সিলসিলা হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি লিখেন যে, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী মিয়া নূর মুহাম্মদ রফিক সাহেবের পুত্র ছিলেন। সেইসাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী মিয়া ইমাম দ্বীন সাহেবের পৌত্র এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী মিয়া পীর মুহাম্মদ সাহেব ও মোকাররম হাফেজ মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের ভাতিজা ছিলেন। জামা'তী কাজে তিনি উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ গ্রহণ করতেন। দীর্ঘকাল সেক্রেটারী মাল হিসাবে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আনসারুল্লাহ্র যয়ীম ছিলেন, ইমামুস সালাত ছিলেন, মুরব্বী আতফাল হিসেবেও তিনি দ্বায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বলেন, শৈশবে আমি দেখেছি যে, তিনি একটি বক্সে আলাদা করে পয়সা রেখে দিতেন আর জিজ্ঞেস করলে বলতেন চাঁদার টাকা আমি পৃথক করে রেখে দেই যেন সময়মতো চাঁদা দিতে পারি। তিনি খুবই উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে তবলীগ করতেন। তার মাধ্যমে অনেক সৎ প্রকৃতির

মানুষ আহমদী হয়েছেন। তিনি দোয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন, নিয়মিত নামায, রোযা ও তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি কিছুদিন বুর্কিনা ফাসোতে ছিলেন। তিনি বলেন, আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে ২০১৬ সালে তিনি বুর্কিনা ফাসোতে আসেন। সেই দিনগুলোতে জামা'তী যত জলসা ও ইজতেমা হয়েছে সেগুলোতে তিনি অংশ গ্রহণ করতেন এবং খুবই আবেগের সাথে উচ্চ স্বরে 'নারা' উচ্চকিত করতেন। উপস্থিত লোকদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেন এবং নিজেও প্রশান্তি লাভ করেন, কেননা পাকিস্তানে দীর্ঘ দিন জলসা না হওয়ার কারণে তার হৃদয়ের অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিবারিত হয়েছে। তিনি তার শোকসন্তপ্ত পরিবার হিসেবে স্ত্রী বশীরা বেগম সাহেবা এবং তিন ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে গেছেন।

বুর্কিনা ফাসোর আমীর ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লিখেছেন যে, যখন তিনি বুর্কিনা ফাসোতে আসেন, যদিও ভাষা জানতেন না, সেখানে ফ্র্যাঞ্চ ভাষা বলা হয়ে থাকে, কিন্তু তার ভালোবাসার ভাষা সবাই বুঝতো আর তিনি সকলের সাথে এতটা আন্তরিকতার সাথে মিশতেন যে, তার আন্তরিকতার কারণে সবাই তাকে পছন্দ করত। তার মৃত্যুতে স্থানীয়রা খুবই আন্তরিকতার সাথে তার স্মৃতিচারণ করেন। তিনি লিখেন, তার মৃত্যুর পর আমাদের ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত বাপিনা সাহেব তার ছবি শেয়ার করেন এবং লিখেন যে, বুর্কিনা ফাসোতে অবস্থানকালে তার সাথে যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তাকে আমি একজন খাঁটি এবং মহান আহমদী হিসেবে পেয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা এবং অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরকে তার দোয়ার উত্তারাধিকারী করুন। বুর্কিনা ফাসোতে কর্মরত তার মুরব্বী পুত্র জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি।

তৃতীয় জানাযা হলো গোলাম ফাতেমা ফাহ্মিদা সাহেবার। তিনি মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি আজাদ কাশ্মীরের কোটলির দুলিয়া জাট্টার বাসিন্দা ছিলেন। ২০২০ সালের ১৮ জুলাই তারিখে বাহাত্তর বছর বয়সে দীর্ঘকাল অসুস্থতার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৪৪ সনে তার পিতা বয়আত করেছিলেন, যার নাম ছিল নেক মুহাম্মদ উরফ্ কালে খান। বয়আতের পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, আমি কোন বুযুর্গের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি। যখন আমি সেই বুযুর্গকে দেখলাম তখন আমি দৌড়ে গিয়ে তার সাথে কোলাকুলি করলাম। সেই বুযুর্গ কালে খানকে বলেন, কালে খান! আপনি কবে আমাদের কাছে আসছেন? তখন কালে খান সাহেব বলেন, আমি তো এসেই গেছি। এরপর তিনি বলেন যে, যখন এক ব্যক্তির কাছে তিনি খলীফা সানীর ছবি দেখেন তখন তিনি তাকে চিনে ফেলেন এবং বলে উঠেন যে, এই বুযুর্গ ব্যক্তিকেই আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। এরপর তিনি পত্রযোগে বয়আত করেন। তার বয়আতের পর তার স্ত্রীও বলেন যে, আপনার সাথে আমারও বয়আত করিয়ে দিন আর তিনিও বয়আত করেন। স্বামী স্ত্রী উভয়েই খুব নিষ্ঠাবান ছিলেন। একইভাবে তাদের সন্তানদের ওপর মরহুমা ফাহ্মিদা ফাতেমা সাহেবার তরবিয়তের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তিনি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন এবং তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন। নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তার সন্তানরা বেশিরভাগ সময়েই তাকে রাতে উঠে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কান্নাকাটি করতে দেখেছে। জুমুআর নামায পড়ার জন্য যখন মহিলাদের অনুমতি ছিল তখন তিনি জুমুআর নামাযের জন্য এক ঘন্টা পূর্বেই মসজিদে চলে যেতেন আর নফল নামায ও দোয়ায় সময় অতিবাহিত করতেন। তিনি অনেক সাহসী, দৃঢ় মনোবলের অধিকারিণী এবং ধৈর্যশীলা ছিলেন। তার স্বামী ১৯৬৫ এবং ৭১ সনের যুদ্ধে দুইবার বন্দি হন। প্রথমবার তো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার স্বামীর জীবিত থাকার বিষয়ে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি এবং ধরে নেয়া হয় যে, তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। এমনকি তার গায়েবানা জানাযার নামায পর্যন্ত পড়া হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মরহুমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তার স্বামী জীবিত আছেন এবং অবশ্যই ফিরে আসবেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন আর তার

স্বামী মুক্তি লাভের পর ফিরে আসেন। মরহুমা শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী জনাব মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব ছাড়া চার পুত্র এবং দুই কন্যা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। তার তিন পুত্র ওয়াকফে জিন্দেগী। মুহাম্মদ জাভেদ সাহেব জাম্বিয়ায় মুবাল্লিগ হিসেবে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন। তিনি মায়ের মৃত্যুতে পাকিস্তানে যেতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে কৃপা ও মাগফিরাতপূর্ণ আচরণ করুন। তার সন্তানদেরকে তার পুণ্য সমূহ ধরে রাখার তৌফিক দিন।

পরবর্তী জানাযা হলো জনাব মুহাম্মদ আহমদ আনোয়ার হায়দারাবাদী সাহেবের, যিনি গত ২২ মে তারিখে ৯৪ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার দাদা শেখ দাঊদ আহমদ সাহেবের মাধ্যমে তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয়। প্রাথমিক বয়সে তার পিতা নিজের দুই পুত্রকে, অর্থাৎ মুহাম্মদ আহমদ আনোয়ার সাহেব এবং মজীদ আহমদ সাহেবকে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কাদিয়ানে প্রেরণ করেছিলেন। কাদিয়ানে মিনারাতুল মসীহ্তে আযান দেয়ারও তার সৌভাগ্য হয়েছে। মুহাম্মদ আহমদ সাহেব শুরু থেকেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সাথে থাকেন এবং দেশবিভাগের পর হুযূরের সাথে রাবওয়ায় চলে আসেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সাথে তার ড্রাইভার হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। তিনি তার শিক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন করেন ফিজিক্যাল এজুকেশনে। তারপর উর্দূতে এম.এ. করেন ইসলামীয়াতে। অতঃপর ডি.পি.-এর কোর্স পাশ করেন। তিনি তালীমুল ইসলাম কলেজে দীর্ঘকাল সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। অর্থাৎ তিনি সেখানেও কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এরপর সাময়িক ওয়াকফ করে ১৯৭৩ থেকে ৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি তিন বছর গাম্বিয়ায় অবস্থান করেন। ১৯৭৮ থেকে ৮৬ সাল পর্যন্ত নাইজেরিয়ায় মহিলা কলেজে ইসলামী শিক্ষার শিক্ষক ছিলেন। ১৯৮৮ সনে পাকিস্তান থেকে জার্মানী হিজরত করেন আর ২০০৯ সনে সেখান থেকে যুক্তরাজ্যে চলে আসেন এবং এরপর থেকে এখানেই বসবাস করেন। মরহুমের চার পুত্র এবং দুই কন্যা রয়েছে যাদের সবাই বিবাহিত। মরহুম জার্মানীর কাযা বোর্ডের নায়েব সদর ছিলেন। এক সময় জার্মানী জামা'তের অডিটরও ছিলেন। তার কন্যা আমাতুল মজীদ সাহেবা বলেন, আমার পিতা দোয়ার এক ভাণ্ডার ছিলেন। নিজের জীবনে তিনি শুধু নামায, কুরআন, রোযা এবং খিলাফতের সেবা করাকে নিজের ধ্যান-জ্ঞান মনে করতেন, আর আমাদের সবাইকেও তা-ই শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে কৃপা ও মাগফিরাতপূর্ণ আচরণ করুন।

আজকের শেষ যে জানাযা, তা হলো সিরিয়ার জনাব সেলিম হাসান আলজাবি সাহেবের। তিনি গত ৩০ জুন তারিখে ৯২ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার কন্যা লুবনা আলজাবি সাহেবা এবং তার দৌহিত্রী হিব্বা আলজাবি সাহেবা, যিনি ডাক্তার বেলাল তাহের সাহেবের স্ত্রী, এখানে যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন। তিনি বলেন, সেলিম আলজাবি সাহেবের জন্ম হয়েছিল ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে দামেস্ক-এর উপকণ্ঠীয় অঞ্চলে। একজন সাদাসিধা আহমদী কৃষক জনাব আবু যাহাব সাহেবের মাধ্যমে ১৮ বছর বয়সে জাবি সাহেবের আহমদীয়াতের সাথে পরিচয় ঘটে। এতে জাবি সাহেব ইস্তেখারা করলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে স্বপ্নে দেখেন আর স্বপ্নেই তাঁর (আ.) হাতে বয়আত করেন। পরবর্তীতে আবু যাহাব সাহেব তাকে ইসলামী নীতি-দর্শন পুস্তকের আরবী অনুবাদ প্রদান করেন। এই পুস্তকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখে সিরিয়া জামা'তের তখনকার আমীর জনাব মুনীর আলহুসনী সাহেবের কাছে গিয়ে তিনি বয়আত করেন। তার পরিবারের মধ্যে পিতার পক্ষ থেকে চরম বিরোধিতা ছিল, কিন্তু মরহুম ছিলেন দৃঢ়-অবিচল। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র যুগে তার পাকিস্তান যাওয়ার সুযোগ হয়। সেখানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সাহচর্যে তিনি রাবওয়ায় ছয় বছর অতিবাহিত করেন আর সেখানেই ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং উর্দূ ভাষাও শিখেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর নির্দেশে পাকিস্তানেই তার

বিয়ে হয় এবং হুযূর তার বিয়ে পড়ান। অর্থাৎ তার স্ত্রী পাকিস্তানী ছিলেন। মরহুমের পৌত্রী হেবা জাবী সাহেবা লিখেন, আমাদের দাদা সর্বদা আমাদেরকে উপদেশ দিতেন আর তালীম ও তরবিয়তের জন্য সময় দিতেন, এছাড়া আধ্যাত্মিক উন্নতি ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততার মতো বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতেন। কয়েক বছর পূর্বে তার স্ত্রী ইন্তেকাল করেছিলেন। তার ছয়জন সন্তান ছিল, এক ছেলে ডাক্তার নঈম আলজাবী সাহেব কয়েক বছর পূর্বে অপহৃত হয়েছিলেন আর আজ পর্যন্ত তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। ওয়াসীম আলজাবী সাহেব পোল্যাণ্ড জামা'তের সদস্য এবং হেবা জাবী'র পিতা। এছাড়া দুই কন্যা ও দুই পুত্র সিরিয়াতে বসাবাস করেন। হেবা জাবী সাহেবাও এখানে জামা'তের সেবা (করছেন) বিশেষভাবে বই-পুস্তক অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং কাজ করেন। তার স্বামী বেলাল তাহেরও অনুবাদের কাজ করেন আর ইনি তাকে সাহায্য করেন। আল্লাহ্ তা'লা তার নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় বরকত সৃষ্টি করুন আর তাদেরকে তত্ত্বজ্ঞানেও সমৃদ্ধ করুন।

তার মেয়ে লুবনা আব্দুল খবীর আলজাবী লিখেন, (প্রয়াত পিতা) আমাদেরকে কুপ্রথা ও বিদআতের অনুসরণে বারণ করতেন আর আল্লাহ্‌র সাথে নিবিড় সম্পর্ক বন্ধন রচনা ও তবলীগ করার উপদেশ দিতেন। দরিদ্রদের পেছনে অনেক খরচ করতেন। সিরিয়া এবং লেবাননে মরহুমের মাধ্যমে অনেক মানুষ বয়আত করেন, তাদের মধ্যে খ্রিষ্টানরাও ছিল। তিনি আরো বলেন, মরহুম আমাদেরকে শেষ যে ওসিয়্যত করেছেন তা হলো, সদা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে এবং যুগ খলীফার উপদেশাবলীর ওপর আমল করবে। তবলীগের ক্ষেত্রে আলস্য দেখাবে না সর্বদা দোয়ার মাধ্যমে সকল কাজ করবে আর সত্যের খাতিরে কোন প্রকার নির্যাতনের ভ্রুক্ষেপ করবে না। লেবাননের প্রেসিডেন্ট উমর আল্লাম সাহেব লিখেন, আহমদীয়াতের সাথে পরিচিত হওয়ার পূর্বে আমরা প্রয়াত সেলীম আলজাবী সাহেব রচিত বই-পুস্তক পাঠ করতাম আর এতে যুগ ইমামের আবির্ভাব এবং তাঁর জামা'তের প্রতি ইঙ্গিত থাকতো। আমরা যখন তার সব বই পড়া শেষ করি এরপর তিনি আমাদেরকে মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'ত সম্পর্কে অবহিত করেন এবং বয়আত করার জন্য বলেন। এটি তার নিজস্ব একটি রীতি ছিল, সব জায়গায় এটি পুরোপুরি কার্যকর হওয়া আবশ্যক নয়। যাহোক, তিনি এভাবে তবলীগ করেন আর বহু লোককে তবলীগের মাধ্যমে আহমদী বানান। এরপর বলেন, এখন আমার বইপুস্তক বাদ দিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাগণ ও জামা'তের পুস্তকাদি পাঠ করুন।

তিনি আরো বলেন, আমরা যারা লেবাননের প্রথম দিকের আহমদী তারা মরহুমের মাধ্যমে বয়আত করেছিলাম আর আমরা এ বিষয়ে তার অনুগ্রহ স্বীকার করছি এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ও তার জন্য দোয়া করি। বর্তমানে কানাডায় বসবাসকারী সিরিয়ান আহমদী মো'তাযাল কাযাক সাহেব বলেন, (আমি) সিরিয়ায় একটি স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলাম, তখন অসংখ্যবার আলজাবী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হয়। আমি দেখেছি, যখনই খিলাফতের উল্লেখ হতো তখন অধিকাংশ সময় তিনি বলতেন, খিলাফতের চরণে আমার মৃত্যু হবে– এটিই আমার আকাঙ্ক্ষা।

এখানে আরবী ডেস্কে কর্মরত আমাদের মুবাল্লিগ মীর আঞ্জুম পারভেজ সাহেব বলেন, খিলাফতের বরাতে যখনই কোন কথা বলা হতো, তা মাথাপেতে মেনে নিতেন আর অবলীলায় একথা বলতেন যে, জামা'তের ব্যবস্থাপনা আমাকে যে নির্দেশ দিবে আমি তার আনুগত্য করবো। ২০১১ সনে সিরিয়া থেকে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসায় যোগদান করেন আর বলতেন, আমার বাসনা হলো, এখানে যুগ খলীফার পদতলে আমার প্রাণ-বিসর্জণ দেওয়া আর আমার জন্য এর চেয়ে বড় সম্মানের আর কিছু নেই। জাবী সাহেবের মাধ্যমে অনেক মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে আর তাদের মধ্যে সিংহভাগ জামা'ত ও খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত

এবং নিষ্ঠাবান আহমদী। আমাকে অনেকে চিঠিও লিখেছে যে, আমরা তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি আর তার মাধ্যমেই আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি। জাবী সাহেব আরো বলতেন, হযরত মওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব স্বয়ং আমাকে বলেছিলেন, আমার পুস্তক 'হায়াতে কুদসী'র আরবী অনুবাদ কর যাতে আরবরা অবগত হয় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীরা কেমন ছিলেন? অতএব তিনি হায়াতে কুদসী বইটির আরবী অনুবাদও করেছিলেন। আরবী তো তার মাতৃভাষা ছিল, এছাড়া তিনি উর্দূও জানতেন আর খুব ভালোভাবে বলতে পারতেন, সেইসাথে ফার্সীও বলতে পারতেন। কাজ চালানোর মতো ইংরেজি ভাষাও তার জানা ছিল। ২০০৫ সনে আমি যখন কাদিয়ান জলসায় গিয়েছিলাম, সেখানেও স্বল্প সময়ের জন্য আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন, কিন্তু পরম বিনয়ের সাথে। এরপর যুক্তরাজ্যের জলসায় এসেছিলেন, এখানেও আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং একান্ত বিনয়ের সাথে বলেন, আহমদীয়া খিলাফতের প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে এবং আমি পূর্ণ আনুগত্য ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক রাখি। আমার জন্য দোয়া করুন যাতে সর্বদা জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত থাকি। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানসন্ততি এবং বংশধরদেরও ষোলআনা বিশ্বস্ততার সাথে জামা'ত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন আর তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

যেমনটি আমি বলেছি, এখন জুমুআর নামাযের পর, সম্ভবত বলি নি, কিন্তু যাহোক, জুমুআর নামাযান্তে এদের সবার গায়েবানা জানাযা পড়াবো। (ইনশাআল্লাহ্)